নীল নদ ও পিরামিডের দেশে

শোভন শামস

এশিয়া ছাড়িয়ে আফ্রিকা, এই মহাদেশের সীমানা অতিক্রম করে নতুন মহাদেশ, দেশ ভ্রমনের শখ ও সুযোগ আমাদের খুব কমই হয় । তাই সুযোগ যখন হলো তখন কল্পনার চোখে ও ছবিতে দেখা পিরামিড ও নীল নদের দেশ ঘুরে দেখতে ইচ্ছা হলো এবং সময়ের স্রোতে চলেও গেলাম নীল নদ ও পিরামিডের দেশ মিসরে ।

সাইপ্রাস থেকে সপ্তাহে দুই দিন ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে যাত্রীবাহী জাহাজে করে মিশরে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে । ট্রাভেল এজেন্টরা এ ধরনের ভ্রমনের ব্যবস্থা করে থাকে । সাইপ্রাস থেকে যেতে হলে, বাংলাদেশী পাসপোর্টধারীদের জন্য মিশরের ভিসা প্রয়োজন, তবে অনেক দেশের ভ্রমনকারীদের জন্য তা লাগে না । বিকেলে সাইপ্রাস থেকে রওয়ানা হয়ে পরদিন সকাল ৮/৯ টার দিকে জাহাজ পোর্ট সাঈদ বন্দরে এসে পৌছায়, পোর্ট সাঈদ সুয়েজ ক্যানেল এর পাশে মিশরের একটা অন্যতম প্রধান ও ব্যস্ত বন্দর। এটা মিশরের একটা বেশ বড় বন্দর নগরী এবং ফ্রি পোর্ট। পোর্ট সাঈদ বন্দরে জাহাজ থেকে নামার সাথে সাথে অসংখ্য স্যুভেনির বিক্রেতা আমাদের ছেঁকে ধরল । বন্দর থেকে বের হওয়ার পথেও অনেকে ছোট বাক্স কিংবা টেবিলে দোকান সাজিয়ে বসেছে । এ সব জিনিসের মধ্যে আছে প্যাপিরাসের উপর প্রাচীন মিশরীয় বিভিন্ন চিত্র কর্ম, পিতল ও তামার পাতের উপর একই ধরনের খোদাই করা চিত্র, পিতলের উট ও আরব দেশের পোষাক পরিচ্ছদ । প্রথমে নামার সাথে সাথে দাম খুব বেশী চায় । আস্তে আস্তে দাম কমতে থাকে এবং বুদ্ধি করে কিনতে জানলে কমদামে ভালই জিনিস পত্র স্যুভেনির হিসাবে কেনা যায় । এরা মিশরীয় পাউন্ড ও সাইপ্রাস পাউন্ড উভয় মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে । বন্দরের বাইরে ট্রাভেল কোম্পানীর বাস সারি বেধে দাড়িয়ে ছিল । বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকজনের জন্য আলাদা আলাদা বাস । ইংরেজী, গ্রীক, ফ্রান্স, রাশান, সুইডিস ইত্যাদি ভাষার লোকদের জন্য আলাদা আলাদা বাস ও গাইডের ব্যবস্থা আছে । সংগত কারনেই ইংরেজী ভাষার বাসে উঠলাম । আমাদের গাইড একজন মিশরীয় মহিলা । ভালই ইংরেজী বলতে পারে । সবাই বাসে উঠার পর বাস কনভয় হিসাবে কায়রোর পথে রওয়ানা হলো । সব বাসকে ট্যুরিষ্ট অথরিটি পুলিশ এসকর্ট দিয়ে নিয়ে যায় ।

পোর্ট সাঈদ ফ্রি পোর্ট বলে এখান থেকে বের হওয়ার পথে দুই জায়গায় বাস থামাতে হয় । কাষ্টমস চেক পয়েন্টে কারো যদি মূল্যবান কিছু থাকে তাহলে তা ডিক্লেয়ার করিয়ে নিতে হয় । পোর্ট সাঈদ থেকে কায়রো প্রায় ১৯০ কিঃমিঃ পথ এবং কনভয়ে করে যেতে প্রায় তিন ঘন্টার মত লাগে । পোর্ট সাঈদ এর পথে চলতে চলতে অনতিদূরে সুয়েজ ক্যানেল দেখলাম । একটা জাহাজ তখন ক্যানেল দিয়ে যাচ্ছিল । এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যোজক । কায়রোর পথে যেতে ইসমাইলিয়া নামের একটা শহর অতিক্রম করতে হয় । এটা পার হয়ে কায়রো । মরু ভূমির মধ্যেই রাস্তা। এর মধ্যেই কৃষকরা অস্থায়ী ক্যাম্পের মত বানিয়ে নিয়ে কোন কোন জায়গায় চাষ করছে । বেশীর ভাগ এলাকা মরুময় হলুদ বেলে মাটি। মাঝেমাঝে পানি সেচের ব্যবস্থা আছে। দূরে বালিয়ারি ও ধু ধু মরুভূমি দেখা যায় । সেই মরুময় এলাকায় জনবসতি নাই বললেই চলে এবং পথিমধ্যেই যাও আছে

তারা নিম্নবিত্ত, কেউ উটে চড়ে চলাচল করছে । দুই একজনকে দুরে হেঁটে যেতেও দেখলাম প্রচন্ড রোদে । বাংলাদেশের জনবিরল অবস্থা হলে যেমন হতো ঠিক তেমনি । জীবন যাত্রার মান তেমন উন্নত নয় । অনুন্নত ও পুরানো ধাঁচের । গাইড আমাদের বিভিন্ন পুরানো ইতিহাসের বর্ণনা ধারাবাহিক ভাবে জানাতে লাগল । আমাদের প্রথম গন্তব্য হবে কায়রো মিউজিয়াম, তারপর গীজার পিরামিড এলাকা এরপর স্ফিংকস এবং সবশেষে একটা প্যাপিরাস কারখানা, এগুলো দেখতে দেখতেই একটা দিন কেটে যায় । দিনটাও বেশ বড় সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৮টা পর্যন্ত । বাসের মধ্যেই গাইড হিরোগ্লাফিক বর্নমালায় নিজের কিংবা প্রিয়তম/তমার নাম লিখা বিভিন্ন সাইজের লকেটের অর্ডার নিচ্ছিল । এরা অতি দ্রুত রুপা কিংবা সোনার পাতে এই ছবির বর্নমালার সাহায্যে নাম লিখে থাকে, এর সাথে তা পড়ার জন্য একটা হার্ডবোর্ডের কাগজ দেয় যাতে বর্নমালার ছবি আছে । বাসের অনেক যাত্রীই এই ধরনের অর্ডার দিল । বাসে সমস্ত পর্যটকই ইউরোপীয় এদের মধ্যে আমি একমাত্র বাংলাদেশী ও এশিয়ান ।

রাস্তার দু পাশের মরুভূমি ও বালিয়ারির দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা কায়রো শহরের উপকণ্ঠে পৌছে গেলাম । কায়রো নীল নদ বিধৌত মিশরের রাজধানী । মিশর হচ্ছে প্রথম দেশ যেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচলন হয় ও রাজধানীতে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রের উপস্থিতি দেখা যায় । নিম্ন বা উত্তর মিশরের রাজধানী ছিল বুটো যার অবস্থান ছিল ব-দ্বীপের কেন্দ্রে। এর রাজার মুকুট লাল রংয়ের এবং এর উপর গোখরো সাপের প্রতিমূর্তি সজ্জিত । উচ্চ বা দক্ষিণ মিশরের রাজধানী ছিল নেসার এটা আসওয়ান ও লুকসর এর মাঝামাঝি । রাজার মুকুট ছিল সাদা রংয়ের এবং এতে শকুনের প্রতিমূর্তি ছিল, উত্তরের প্রতীক ছিল প্যাপিরাস বৃক্ষ ও ফুল এবং দক্ষিণের প্রতীক ছিল শাপলা । রাজার মিনেস এর সময় এই উত্তর ও দক্ষিণের সম্মিলন ঘটে । তিনি উত্তর ও দক্ষিণ মিশরের মাঝে মেমফিসে প্রথম একত্রীকৃত মিশরের রাজধানী স্থাপন করেন । মেমফিস বর্তমান কায়রোর থেকে ২২ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত । মিশরের রাজধানী হিসেবে যে কোন শহরের গোড়া পত্তনের জন্য নীল নদের অববাহিকার এলাকাই সব সময় উপযুক্ত বলে গণ্য করা হতো । ইতিহাসের বিবর্তনে মিশরের রাজধানী বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন বার মেমফিসের দক্ষিণে আহনাসিয়া অথবা লুকসর এর থিবস এর মাঝেই পরিবর্তিত হতো । ৩৩২ খৃঃপূঃ যখন আলেকজান্ডার মিশরে প্রবেশ করেন তখন তিনি রাজধানী ব-দ্বীপের পশ্চিম থেকে আলেকজান্দ্রিয়াতে স্থানান্তর করেন । লোকজনকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোর মাঝেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো অবস্থিত ছিল । টলেমিয় এবং রোমক উভয় শাসন আমলে আলেকজান্দ্রিয়াই মিশরের রাজধানী ছিল ।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আমর-বিন-আল-আস মিশরে প্রবেশ করেন এবং অধিকৃত মিশরে ইসলামের প্রবর্তন করেন । তিনি রাজধানী হিসেবে আলেকজান্দ্রিয়াকেই পছন্দ করেছিলেন তবে খলিফা ওমর ইবনে আল খাতাব তাকে নতুন শহর নির্মানের নির্দেশ দেন । ৬৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাবিলন দূর্গের পাশে মিশরের প্রথম ইসলামিক রাজধানী আল-ফুসতাত এর গোড়া পত্তন করেন । ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় শাসকগন উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেন । তখন শাসন কর্তা সালেহ-বিন-আলী পূর্বের রাজধানী পরিবর্তন করে আল-ফুসতাত এর উত্তরে রাজধানী হিসেবে আল মাসকার শহরের পত্তন করেন । এই নতুন সামরিক রাজধানী দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং আল-ফুসতাত এর সাথে মিলিত হয়ে বিশাল নগর এ পরিণত হয় । ৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইবনে তুলুন তৃতীয় ইসলামিক রাজধানী হিসেবে আল কাতাই নগরীর পত্তন করেন । এটাও একটা সামরিক শহর ছিল । পূর্বের দুটো শহরের সাথে মিলিত হয়ে এটাও একটা বিশাল নগরে রুপান্তরিত হয় । ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ফাতেমীয় সেনাপতি গওহর আল-সিকলি কর্তৃক মিশরের ক্ষমতা দখলের পর তার দ্বারা আল-কাহিরু বা কায়রো নগরীর পত্তন হয় এবং সে সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কায়রো মিশর এর রাজধানী এবং ইসলামের

প্রানকেন্দ্র হিসেবে বহাল আছে। আজকের কায়রো ১২ মিলিয়নের মত জনসংখ্যা দ্বারা অধ্যুষিত । কায়রোতে বর্তমানে তিনটা গভর্নরেট এবং ২৮ টা কোয়াটার। এই ঐতিহাসিক শহরটা বর্তমানে আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল শহর। এটা মধ্যপ্রাচ্যের একটা অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ।

কায়রো শহরের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দুই বার নীল নদের উপর বানানো ব্রীজ পার হলাম। অনেক স্মৃতিস্তম্ভ, বিশাল বিশাল মসজিদ ও অন্যান্য আধুনিক স্থাপত্য এবং এর পাশাপাশি পুরানো বাড়ীঘর ও দারিদ্রের ছাপ দেখতে দেখতে আমরা মিশরের কায়রো মিউজিয়ামে পৌছে গেলাম । এই জাদুঘরে ফেরাউন, পিরামিড থেকে পাওয়া জিনিসপত্র এবং মমির সংগ্রহ আছে । মিউজিয়ামের বাইরে বিশাল পার্কিং এরিয়াতে অনেক ট্যুরিষ্ট বাস ও অন্যান্য যানবাহন পার্ক করা। মানুষের প্রচন্ড ভিড়, বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আগমনে এলাকাটা আন্তর্জাতিক দর্শনীয় স্থানের মর্যাদা পেয়েছে । ২০ লিরা দিয়ে টিকেট কেটে ভিতরে ঢুকতে হয় । ক্যামেরা নিয়ে ভেতরে গেলে আরও ১০ লিরা বা মিশরীয় পাউন্ড দিতে হয় ।

প্রচন্ড ভিড় ভেতরে, গাইডরা গাড়ীর নাম্বার প্লেকার্ড লিখে বহন করে এগিয়ে যায় ও গাড়ীর যাত্রীরা তার পিছু পিছু যায় । একেকটা সংগ্রহের পাশে এসে দাড়ানোর পর গাইড তার বিশেষত্ব বর্ননা করে । সারা মিউজিয়ামে এ ধরনের অজস্র গ্রুপ ঘুরে ঘুরে দেখছে। শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড়। চিৎকার করে সব কিছু বর্ণনা করতে হয় । এ এক এলাহি কারবার । মমি যেখানে রাখা আছে সেখানে প্রচন্ড ভীড়। ভ্যাপসা গরম । ঘাম ও মানুষের ভীড়ে দুর্বিসহ অবস্থা তবুও সবাই তা দেখতে যায় । যে কোন এক দিক থেকে শুরু করে সার্কেল কমপ্লিট করে বের হয়ে যেতে হয় । অনেকে আবার ফেরাউন ও পিরামিড এর উপর গবেষণা করছে । তারা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে গভীর ভাবে ব্যস্ত । এক কথায় বলতে গেলে চরম ব্যস্ততা মিউজিয়ামের সর্বত্র । ভেতরে ঢোকার পথে কয়েকটা বই এর দোকান ও স্যুভেনির শপ আছে। এখানে মিউজিয়াম, পিরামিড , মমি ও মিশর সম্বন্ধে বিভিন্ন বই পাওয়া যায় । তাছাড়া কার্ড, ছোট পিরামিডের স্যুভেনির ইত্যাদিও বিক্রি হয় । ভেতরে ঢুকে সব কিছু দেখে আসতে কম করে হলেও দুই ঘন্টা লাগে । আর আমাদের বরাদ্দ সময় ছিল ১-৩০ ঘন্টা তাই অনেক কিছু শর্ট কার্ট করতে হলো । মিউজিয়ামের বাইরেও অনেক মূর্তি ও স্তম্ভ আছে । অনেক দর্শনার্থী সেখানে বসে পড়ছে কিংবা ছবি তুলছে । সব জায়গায়ই ব্যস্ততা । শিল্পকর্ম তথা পুরাকীর্তি/ফেরাউনের সময় কালের চিত্রকলা সংরক্ষনের জন্যও একটা বড় মিউজিয়াম স্থাপনের জন্য সর্ব প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহন করেন একজন ফরাসী মিশর বিশেষজ্ঞ (মেরিয়েত পাশা) । এর ২০ বছর পর ফরাসী স্থপতি (মার্শাল দোরগনন) বর্তমানে কায়রোর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মিশরীয় মিউজিয়ামের নকসা প্রনয়ন করেন । ১৯০২ সালে এই মিউজিয়াম এর উদ্বোধন হয় ও প্রথম পরিচালক হিসেবে গ্যাস্তো ম্যাসপারো এর দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন । মিউজিয়ামটি দ্বিতল ভবন এবং এর মধ্যে বিশাল লাইব্রেরী ও ১০০ টা প্রদর্শনী কক্ষ/রুম আছে । মিউজিয়ামের বাগানে মার্বেল পাথরের স্তম্ভের উপর অগাস্তো মেরিয়েত এর নাম, জন্ম ও মৃত্যু দিবস এর ফলকসহ একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে । এছাড়াও অনেক মিশর বিশেষজ্ঞের মূর্তি বাগানে স্থান লাভ করেছে । এই মিউজিয়ামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ হলো তুতেন খামেনের সোনার কফিন। তুতেন খামেন এর সোনার কফিনটি ৪৫০ পাউন্ড খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল । এটা সম্ভবত ইতিহাসের নিখূত এবং বৃহৎ স্বর্ণকারের সৌকর্য প্রতিফলিত করে । এই কফিনে বালক রাজা তুতেন খামেনের মমি রক্ষিত ছিল । তিনি ১৮ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরন করে ছিলেন ।

অন্যান্য মাষ্টার পিসের মধ্যে রয়েছে প্রাচীন রাজ্যের রাজারা যেমন সেওপস, সেফরেন এবং মাইকারিয়াস । এখানে টুটমোস-২ এর মূর্তি ও অন্যান্য সংগ্রহ স্থান পেয়েছে । আরো আছে রামসেস-২ এর বেশ

কিছু মূর্তি । মিশরীয় মিউজিয়ামের প্রধান প্রবেশ পথ এর দরজার দুপাশে প্রাচীন মিশরের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের প্রতীক সম্বলিত দুটো মুর্তি রয়েছে যার একটা শাপলা (লোটাস) ও অন্যটা প্যাপিরাস ধরে রয়েছে । এগুলো দুই মিশরের প্রতীক ছিল । এ ছাড়াও অজস্র মূর্তি, স্বর্ণ ও অন্যান্য ব্যবহার্য অলংকার ও নানাবিধ ব্যবহার্য জিনিসে মিউজিয়াম ভরপুর । সারা পৃথিবী থেকে লোকজন আসছে তা দেখার জন্য। কখন যে দেড় ঘন্টা কেটে গেল টেরই পাইনি । মনে হয়েছে এইত কিছুক্ষণ আগে এলাম । যাক গাইড আমাদেরকে বাসের কাছে নিয়ে এলো ।

পরবর্তী গন্তব্য হলো গিজা । গিজার - পিরামিড দেখা । মিউজিয়াম থেকে গিজা শহরে যেতে ২০/২৫ মিনিট লাগে । শহরটা মূলতঃ গড়ে উঠেছে পিরামিডের অবস্থানের জন্য এবং সবকিছুই একে ঘিরে আবর্তিত । এখন অনেক দোকান পাট, প্যাপিরাস ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য ভবন ও বাসস্থান নিয়ে গিজা শহর গড়ে উঠেছে । পিরামিড এর এলাকা শহর থেকে প্রায় ৪০ ফুট উচু । সব ট্যুরিষ্ট বাস এই উচ্চতায় এসে একজায়গায় জড়ো হয় । বাসেই পিরামিড দেখার টিকেট দেয়া হয় ২০ মিশরীয় পাউন্ড । বাস থেকে নামার পর প্রথমে তাপমাত্রা সহ্য করে নিতে হয় । বেশ গরম এবং ধু ধু মরুময় এলাকা এবং এর মাঝে সগর্বে মাথা উচু করে ৩টা বিশাল পিরামিড ও অন্যান্য ছোট ছোট পিরামিড দাড়িয়ে আছে । বিশাল এলাকা জুড়ে এর বিস্তার । এর বিশালতা মানুষকে হতবাক করে দেয় । এর মধ্যে বিপত্তি উট চালক ও বিভিন্ন হকার। ট্যুরিষ্টদেরকে তারা ছেঁকে ধরে । স্বাধীন ভাবে চলা বেশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠে তখন । তবে দলে থাকলে ঝামেলা একটু কম । সবাই ছবি তুলছে । এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছে প্রচন্ড গরমে । সবচেয়ে বড় পিরামিড সেওপস এ কাজ চলছে সেখানে দর্শনার্থীরা যেতে পারেনা। দ্বিতীয় পিরামিড এ ভিড় লেগে আছে । কেউ কেউ উটের পিঠে উঠে ছবি তুলছে তবে এ ধরনের ছবি তোলার আগে সব কিছু ঠিক করে নিতে হয় কিছু ঠগবাজ লোক ট্যুরিষ্টদের উটের বা ঘোড়ার পিঠে একা গেলে ঝামেলা করে ও অতিরিক্ত টাকা পয়সা আদায় করে নেয় । আমিও উটের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম ও কিছু টাকা দিলাম উটের মালিককে ।

এখন পিরামিড এর কথায় আসা যাক । গ্রীক পর্যটক হেরোডুটাস লিখেছিলেন সেওপস তার মৃত্যুর পর এক বিশাল কর্ম রেখে গিয়েছেন এবং তা হলো পিরামিড । সেওপস জাঁকজমকের সাথেই মিশরের শাসন কার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং তার প্রজাদেরকে দাস হিসেবে পিরামিড তৈরীতে শ্রম প্রদানে বাধ্য করেছিলেন । এদের কেউ নিয়োজিত ছিল আরাবিয়ান পাহাড় থেকে পাথর কেটে নীল নদ পর্যন্ত টেনে আনার কাজে। এ সব পাথর খন্ড অপর পারে নিয়ে আসা হতো এবং অন্যদল এগুলোকে টেনে গিজার উচ্চ ভূমিতে নিয়ে আসত । এই বিশাল কর্মযজ্ঞ ৩ মাসের একেকটা ভাগে সম্পন্ন হতো এবং এক এক ভাগে হাজার হাজার দাস কাজ করত । যে রাস্তা দিয়ে এই পাথরের চাঁইগুলো টেনে আনা হতো তা তৈরী করতেই ১০ বছর লেগেছিল । এইভাবে শ্রমদিয়ে এই পিরামিড তৈরী করতে ১০ বছর লেগে ছিল ।

পিরামিড এর নীচে ভূগর্ভস্থ সমাধি কক্ষ তৈরী করা আছে । পিরামিড এর বেস চতুস্কোন বর্গাকার। একেকটা বাহুর দৈর্ঘ প্রায় ২৪৬.২৬ মিটার । পিরামিড গুলো মসৃন পাথরের চাই বসিয়ে বানানো হয়েছিল এবং কোন পাথর খন্ডই ৩০ ফিটের কম লম্বা না । পিরামিড তৈরীর কাজ ধাপে ধাপে করা হয়েছিল । এক স্তর হওয়ার পর অন্য স্তরের জন্য পাথর টেনে উঠাতে হতো । অবশ্য এটা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে । এর ফিনিশিং হয়েছিল উপর থেকে নীচের দিকে । ১ম শতকে (খৃঃ পূঃ) সিসিলির ঐতিহাসিক ডিওডোরাস মিশর ভ্রমনে এসেছিলেন তিনি পিরামিডের বিশালতায় মুগ্ধ হয়ে একে সপ্তম আশ্চর্যের একটি হিসেবে অভিহিত করেন । গিজা মানুষকে মানুষের হাতে গড়া কর্মের

দ্বারা অভিভূত করে দেয় । মিশরীয় একটা প্রবাদ আছে, সবাই সময়কে ভয় করে এবং সময় ভয় করে পিরামিডকে এবং এটা নির্ঘাত সত্য ।

কায়রোর প্রাচীন সমাধিস্থল এলাকার বর্তমান নাম গিজা। এটা প্রায় ২০০০ বর্গমিটার এলাকার একটা মালভূমি । এখানে ৩টা পিরামিড যথাক্রমে সেওপস, সেফরেন ও মিকারিনাম এবং স্ফিংকস অবস্থিত। শেষোক্ত পিরামিডের ৩টা ছোট পিরামিড আছে । এই তিনটা পিরামিড কোনাকুনি ভাবে স্থাপিত এবং এদের অবস্থান এমন যে তারা কেউ অপর দুটো এবং সূর্যের মাঝে বাধা হিসেবে দাঁড়ানো নেই । প্রতিটি পিরামিডের এলাকায় একটা করে সমাধি মন্দির আছে । সেওপস এর কমপ্লেক্স বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত তবে সেফরেন এর অনেক কিছুই উদ্ধার করা গেছে। সেওপস এর পিরামিড এই তিনটা পিরামিডের মধ্যে সর্বোচ্চ । এটা ১৪৬ মিটার উচু ছিল । বর্তমানে এটা ১৩৭ মিটার এবং এর কাটা শীর্ষ ১০ বর্গ মিটারের একটা স্কোয়ার এখন। বর্তমানে পিরামিডগুলোর বাইরের মসৃনতা নেই তার বদলে ভেতরের পাথরের চাই বেড়িয়ে পড়েছে এগুলো এবরো থেবরো । এসব চাই ধরে পিরামিডের শীর্ষে কষ্ট করে আরোহন করলে অবর্ননীয় বিশালতা নিজ চোখে দেখা যায় যা সত্যি বিমোহিত করে । সেফরনের পিরামিডের চুড়ায় এখনো কিছু মসৃনতা দেখা যায় সেটা পিরামিডের মূল চেহারা ছিল । এটার উচ্চতা সেওপস এর পিরামিডের সমান প্রায়, কারন এর চুড়া কাটা বা ধ্বংস হয়নি এবং এর ভিত্তি আগে লাল গ্রানাইট পাথরের ছিল ।

মিকারিনামের পিরামিড সবচেয়ে ছোট এবং এর উচ্চতা ৬৬ মিটার । এটা মোটামুটি অক্ষতই আছে শুধুমাত্র বাইরের মসৃনতা নেই এখন । এর অভ্যন্তরে মৃতের সমাধি কক্ষে ব্যাসল্ট পাথরের এক বিশাল কফিন ছিল। এটা পর্তুগালের উপকূলে হারিয়ে যায় । জাহাজে করে এটাকে ইংল্যান্ড নেয়া হচ্ছিল পথে জাহাজ ধ্বংস হলে সেখানেই তা সাগরের বুকে স্থান পায়। এই পিরামিডের এলাকা দেখে মনে হয় সাধারন সময়ের চেয়ে বেশ দ্রুততার সাথে এর কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছিল । কাজেই এর অনেক কিছুই বেশ দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে । পিরামিড এলাকায় ঘন্টা দেড়েক কাটানোর পর সবাই একত্র হলাম, এরপর চললাম স্ফিংস দেখতে । পিরামিড এলাকা থেকে মসৃন রাস্তা চলে গেছে স্ফিংস এর দিকে ।

সেওপস এর পিরামিড থেকে ৩৫০ মিটার দূরে বিশাল সিফংস মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে । আরবীতে এটা আবু-আল-হল অর্থ ফাদার অব টেরর হিসেবে পরিচিত । এটা মানুষের মাথা যুক্ত একটা সিংহের মূর্তি এবং ৭৩ মিটার লম্বা । এই বিশাল মূর্তিটা অনেকের মতে সেফরনের পছন্দ অনুযায়ী তার সমাধি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল । বহু বার এই মূর্তিটা বালুর স্তুপের নীচে চাপা পড়ে ছিল এবং অনেক বার এটাকে খনন করে বের করা হয়েছে । বর্তমানে এই মূর্তিটার মাথা অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত এটা কিছুটা বাতাস এর দ্বারা এবং কিছুটা মামলুকদের কামানের অবদান । তারা এর মাথায় কামানের গোলার সঠিকতা পরীক্ষা করত । স্ফিংস এর এলাকায় এখনও খনন কাজ চলছে এবং অনেক দর্শনার্থীর ভীড় সেখানে। ভেতরে যাওয়ার জন্য সরু রাস্তা আছে ও পর্যটকরা সেখানে গিয়ে এর বিশালতার সাথে একাত্ম হয় । এখানেই খোলা মাঠের মত এলাকায় হকাররা হরেক রকম জিনিষ বিক্রয় করে থাকে । বিশেষত প্যাপিরাসের চিত্র ও বিভিন্ন ধরনের পিরামিড সম্পর্কিত স্যুভেনির । ভেতরে ঢুকে রক্ষনাবেক্ষনের কাজ দেখলাম, বিশাল আয়োজন চলছে । অনেক পর্যটক এখানে ঘুরে ঘুরে দেখছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ।

স্ফিংস দেখার পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হলো প্যাপিরাসের কারখানা পরিদর্শন । গিজা শহরেই অনেক প্যাপিরাসের কারখানা আছে । কারখানায় যাওয়ার পর প্রথমে প্যাপিরাস কাগজ কিভাবে বানানো হয় তার উপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো বক্তৃতার মত । গাছের কান্ডকে পাতলা করে কেটে একটার উপর একটা বসিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হয় পরে তা আপনা আপনি লেগে যায় রাসায়নিক

উপাদানের উপস্থিতির কারনে । একবার লেগে গেলে তা আর কোনক্রমেই নষ্ট হয় না । এই প্যাপিরাসের উপর প্রাচীন মিশরীয়রা লিখত ও বিভিন্ন চিত্রকলা অংকন করত । প্যাপিরাস কারখানায় অজস্র চিত্র শিল্পীর আঁকা মিশরীয় প্রতীক ও অন্যান্য প্রাচীন ছবির বিশাল সংগ্রহ রয়েছে । চিত্রকররা বসে আছে কারখানায় এবং অর্ডার মোতাবেক তারা চিত্র এঁকে দিচ্ছে । অনেকে ছবি ও নাম প্যাপিরাসে লিখে দিতে অর্ডার দিল । অনেকে কয়েকটা প্যাপিরাসে কাগজ কিনে নিল, কাগজগুলো পাতলা তবে ভংগুর না বেশ টেকসই । অনেক আগে বইতে পড়া প্যাপিরাস কাগজে আঁকা গুটি কতক ছবি আমিও কিনলাম স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য । তারপর বাসের সব লোকজন স্যুভেনির শপে গেল । এসব দোকানে পিরামিডের ছোট সংস্করন ও অন্যান্য টুকটাক স্যুভেনির পাওয়া যায় তবে দাম বেশ চড়া । আমি মিশর এর উপর একটা সুন্দর বই কিনলাম।

এরপর ফেরার পালা । আবার কায়রো শহর নীলনদ পার হয়ে মরুভূমির ভিতর দিয়ে পিচঢালা পথে পোর্ট সাঈদ এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম । ফেরার পথে মরুভূমিতে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে পোর্ট সাঈদ এর উপকণ্ঠে পৌছে গেলাম । যখন আমরা পোর্ট সাঈদে পৌছাই তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে । রাতের শহর ঝলমল করছিল আলোতে । আলোর মিছিলের মাঝ দিয়েই মিশর ছুয়ে আসা হলো ।